Bangladesh Journal of Political Economy

© 2010 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 26, No. 2, December 2010, pp. 35-44
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি '৯৭ এবং সকল পর্যায়ে নারীর সম-অধিকার নিশ্চতকরণ

হান্নানা বেগম [১]

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের কথা আছে। অতএব জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের জন্য একটি নারীনীতির প্রয়োজনীয়তা বরাবর অনুভব করা হয়েছে। বিষয়টি ত্বরান্বিত হয়ে যখন বেইজিং কর্মপরিকল্পনা ১৯৯৫ বাস্তবায়নের জন্য নারীনীতির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭-এর ৮ মার্চ নারীনীতি ১৯৯৭ ঘোষণা করে। যা নারীসংগঠনগুলোর সার্বিক আশা বা আন্দোলনের প্রতিফলন। কিন্তু পরবর্তীকালে ২০০৪ সালের সরকার এ নীতির অনেক ইতিবাচক শব্দার্থ নেতিবাচক করে এটি উপস্থাপন করে। যা সর্বসমক্ষে গুরুত্ব পায়নি। ২০০৮ সালের তত্বাবধায়ক সরকার নারীর সম-উত্তরাধিকারকে পাশ কাটিয়ে নারীনীতি ২০০৮ উপস্থাপন করে। কিন্তু মৌলবাদীদের বিশৃঙ্খলা জ্বালাও পোড়াও আন্দোলনের মুখে এটি হিমাগারে চলে যায়। বাংলাদেশে আওয়ালীগ দেশে ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতাহারে ১৯৯৭-এর নারীনীতি বাস্তবায়নের ঘোষণা দেয়। অতএব নারীসমাজের একান্ত আকাক্ষেয় সার্বিকভাবে সুশৃঙ্খল নারীনীতি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একান্তই গুরুত্ববহ। এ নারীনাতীর মর্মকথা ও বিশ্লেষণ সাধারণ জনগণের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জানার বিষয়। ঐ উদ্দেশ্যেই প্রবন্ধের উপস্থাপনা ও নীতির বিশ্লেষণ।

ভূমিকা

"বাংলাদেশের নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কুপমন্ডুপকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। তার মেধা ও শ্রমশক্তিকে শুধুমাত্র সাংসারিক কাজেই ব্যয় করা হয়েছে। সমাজ ও দেশ গঠন কাজে তাকে কখনও সম্পৃক্ত করা হয়নি।" একথাগুলো বাংলাদেশের জাতীয় নারী নীতি '৯৭ এর প্রারম্ভিক পটকথা।

---

১ অর্থনীতিবিদ, সহ-সভাপতি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, শিক্ষাবিদ, নারীনেত্রী – প্রাক্তন অধ্যক্ষ ইডেন গার্লস কলেজ, ঢাকা।

আমাদের জানা আছে- বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের ঘোষণা রয়েছে। সংবিধানের ধারা সাতাশ, আটাশ এর এক,আটাশ এর দুই, আটাশ এর তিন, আটাশ এর চার, ঊনত্রিশ এর এক, ঊনত্রিশ এর দুই, পয়ষট্টি এর তিন এ ঘোষণাকে সমুন্নত করেছে।

প্রবন্ধের ভূমিকার অবতারণায় গত কয়েক দশকের বিশ্বনারী এবং বাংলাদেশের নারীবিশ্ব ও নীতি প্রণয়নের ইতিকথা পরখ করতে চাই –

রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সক্রিয় অবদান রেখেছে। সমৃদ্ধ হয়েছে। সমৃদ্ধ করেছে।

বিশ্বনারী উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় নব্বই এর দশকে চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে ১৯৯৪ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে জাকার্তা ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ ঘোষণায় বলা হয়, ক্ষমতা বন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে তীব্র অসমতা বিদ্যমান। এ অসমতা ও সীমাবদ্ধতা নিরসনের উদ্দেশ্যে সরকারসমূহকে উদ্যোগ নিতে তাগিদ দেওয়া হয়।

কমনওয়েলথ ১৯৯৫ সালে জেন্ডার ও উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

সার্ক দেশসমূহও নারী-উন্নয়নের জন্য কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

১৯৯৫ সালের ৪-১৫ সেপ্টেম্বর বেইজিং চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বেইজিং কর্ম পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে ১২টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়। ক্ষেত্রগুলো হলো - 'নারীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র', 'শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অসম সুযোগ', 'স্বাস্থ্যসেবার অসম সুযোগ', 'নারী নির্যাতন', 'সশস্ত্র সংঘর্ষের শিকার নারী', 'অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার', 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতার অংশগ্রহণে অসমতা', 'নারী উন্নয়নে অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো', 'নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘন', 'গণমাধ্যমে নারীর নেতিবাচক প্রতিফলন এবং অপ্রতুল অংশগ্রহণ', 'পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার' এবং 'মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্য'। এসব অসমতা উত্তরণের লক্ষ্যে জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর একশনে নি:শর্ত স্বাক্ষর দান করে।

আমরা বিশ্বাস করি দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক উন্নয়ন নীতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নীতিহীন পথ কখনও গতিময় হতে পারে না। কিন্তু নীতি প্রণয়নে, নীতি বাস্তবায়নে আমরা পিছিয়ে আছি। নীতির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা আমাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নকে পশ্চাৎমূখী করছে। দ্রুত অগ্রসরমান বিশ্বে আমরা সামনের কাতারে থাকব, এটি আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত আর এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্ধেক জনগণ নারীর জন্য তো বটেই প্রতিটি খাতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা উন্নয়নের জন্য অবশ্যম্ভাবী উপাদান।

বাংলাদেশে একটি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হচ্ছিল বহুদিন থেকে। বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনা এ উপলব্ধিকে ত্বরান্বিত করলো। প্রশ্ন হতে পারে বাংলাদেশ কি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ছাড়া জাতীয় পরিকল্পনা করতে পারে না? তাহলে এতদিন কিভাবে চলছিল? আমরা আপদকালীন অনিয়মে চলছিলাম। এতে উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছিল, আমরা ক্রমান্বয়ে নিয়মমূখী হতে চাই। নিয়ম বলে–

যে কোন জনগোষ্ঠির জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে হলে, দেখতে হয়– সংবিধান তাকে কতখানি অধিকার দিয়েছে। সংবিধানের অধিকার এবং ঐ গোষ্ঠির বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রথমত ঐ ক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্য স্থির করতে হয়। নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্যই তখন নীতিমালা গ্রন্থনার প্রয়োজন পড়ে। পরিশেষে এ নীতিমালা যথার্থ অনুসরণ করে কাজের কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি পড়লে বুঝা যায়, এটি এ নিয়মেই করা হয়েছে।

বেইজিং ঘোষণার পরের বছর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় নারীনীতি প্রদানের জন্য দেশবাসীর কাছে ওয়াদাবদ্ধ হয়। তদনুসারে ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ তৎকালীন সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীনীতি '৯৭ ঘোষণা করেন। এ সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর একশন-এর বাস্তবায়নের জন্য ২৬৪ পৃষ্ঠার নারী উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উদ্যোগ, সমাজ সংগঠক ও এন জি ও-দের নিরলস পরিশ্রমে নারী নীতি ও পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু ঐ সরকারের সময়কালে ঘোষিত নীতি সংসদে উত্থাপিত হয়নি এবং প্রেক্ষিত আইনও প্রণীত হয়নি।

শংকার বাস্তবতা হলো ২০০১ সালে বি.এন.পি. জোট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে এ নীতির গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক শব্দসমূহ পরিবর্তন করে নীতিকে নেতিবাচক করে তোলে। তবে এ নীতির প্রকাশ্য ঘোষণা দেখা যায় নি। বিষয়টি জানাজানির পর নারী সমাজের তীব্র আন্দোলন ও অসন্তোষের মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নারীর উত্তরাধিকার বিষয়কে কিছুটা পাশ কাটিয়ে নারী নীতি ২০০৮ ঘোষণা করে। নীতি ঘোষণার মুহূর্তেই ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের জ্বালাও, পোড়াও, হুমকির মুখে এটি হিমাগারে চলে যায়। স্থবির হয় বাংলাদেশের বহু শ্রমে বহু অর্থের বিনিময়ে করা নারীর অধিকার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা।

আমাদের সৌভাগ্য, ২০০৮ এর নির্বাচনে মহাজোট সরকারের বড় দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নারীনীতি বাস্তবায়নের কথা দেয়। পরবর্তীতে জুন ২০০৯ এর প্রদত্ত বাজেটে সরকার নারীনীতি বাস্তবায়নের সুদৃঢ় ঘোষণা প্রদান করে। বর্তমানে এ নীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। সচেতন জণগণ মনে করে এটি সরকারের একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। এখন এ নীতি সম্পর্কে জানা আমাদের নৈতিক নাগরিক দায়িত্ব।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান। দ্বিতীয়তঃ প্রস্তাবিত নীতিতে নারীর অর্থনৈতিক অধিকারের দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে, এ বিষয়টি তুলে ধরা । আলোচনার সুবিধার্থে প্রবন্ধটি দু'অংশে বিভাজন না করে একই ধারাবাহিকতায় উপস্থাপন করা হলো।

২.১

ঘেষিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি '৯৭ এর অধ্যায় পাঁচটি। প্রথম অধ্যায় অনেকটা পটভূমিকার মত। অর্থাৎ কি পরিস্থিতিতে এটি প্রণীত হয়েছে তার ধারণা, দেশের সংবিধানে নারীর অধিকার ও বিশ্ব প্রেক্ষাপট। শুরুতে রয়েছে বেগম রোকেয়ার উক্তি – "তোমাদের কন্যাগুলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, তাহারা নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করুক।"

স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান।

অবারিতভাবে ধারণা দেওয়া হয়েছে – বেসরকারি সাহায্য সংস্থাগুলি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীর আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে।

দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রাজনৈতিক দলগুলোর, পাশাপাশি নারী সংগঠনগুলোও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে।ফলশ্রুতিতে নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা সচেতন হয়ে ওঠে। এতে করে দেশে নারী উন্নয়নে এক বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। বলা হয়েছে - এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে।

উদ্ধৃত হয়েছে –বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সম অধিকার সমৃদ্ধ ধারাসমূহ। রয়েছে বিশ্ব প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশের কথা। বলা হয়েছে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বনারী সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। এ সম্মেলনে ১৯৭৬-১৯৮৫ সালকে নারীদশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ সিডও গৃহীত হয়। ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ থেকে এটি কার্যকর হয়। নারীর জন্য আন্তর্জাতিক বিল অব রাইটস বলে চিহ্নিত এ দলিল নারীর অধিকার সংরক্ষণের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদন্ড বলে বিবেচিত। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে ধারা ২, ১৩(ক), ১৬(ক) ও (চ)-এ সংরক্ষণ সহ এই সনদ অনুস্বাক্ষর করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়– 'বাংলাদেশে নারীর অবস্থা'

বর্ণনায় বলা হয়েছে - ১৯৭২ সনে বাংলাদেশ সরকার নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। এই বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছিল – স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতিত নারীর সঠিক তথ্য আহরণের জন্য জরিপ কাজ পরিচালনা করা এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা; যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা ; বীরাঙ্গনা নারীসহ যেসব পরিবারের উপার্জনক্ষম পুরুষ মুক্তিযুদ্ধে নিহত হন সেই সমস্ত পরিবারের কর্মক্ষম নারীদের চাকুরি এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা। নারী পুনর্বাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি ক্রমশ: বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সনে এ বোর্ডকে বৃহত্তর কলেবরে পূনর্গঠিত করে সংসদের একটি এ্যাক্ট এর মাধ্যমে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নারীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করে। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায়ও (১৯৭৮-৮০) নারীর কর্মসংস্থান ও দক্ষতাবৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৫-৯০-এ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীর কর্মসূচি একই ধরণের ছিল। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) নারী উন্নয়নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গৃহীত হয়।

বাংলাদেশে নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি নির্যাতন রোধকল্পে কতিপয় প্রচলিত আইনের সংশোধন ও নতুন আইন প্রণীত হয়েছে। এসব আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মুসলিম পারিবারিক আইন, যৌতুক নিরোধ আইন, বাল্যবিবাহ রোধ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ (বিশেষ বিধান) আইন প্রভৃতি।

১৯৯৭-পূর্ব নারী নির্যাতন চিত্রটি এভাবে এসেছে – যদিও ইতোমধ্যে বেশ কিছু আইন প্রণীত হয়েছে। এসব আইনের মৌলিক সংস্কার প্রয়োজন। বিভিন্ন পদক্ষেপ সত্ত্বেও মেয়ে শিশুর অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। মেয়ে শিশুর বাল্যবিবাহ, পাচার, নির্যাতন ও অপব্যবহার চলছে অব্যাহতভাবে।

বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে মেয়ে শিশুর সাংস্কৃতিক, মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। গ্রাম্য সালিশির মাধ্যমে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা দিয়ে ১০১ দোররা, গর্ত করে পাথর মারা, পুড়িয়ে মারার ঘটনাও এদেশে ঘটেছে। নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে একটি উদ্বেগজনক বিষয় হলো রাষ্ট্রীয় তথা পুলিশের নির্যাতন। নিকট অতীতে পুলিশের হাতে বেশ কিছু নারী নির্যাতিত হয়েছে, এমনকি পুলিশ দ্বারা নারী ধর্ষিত ও নিহত হয়েছে। নারী নির্যাতনের মামলাগুলো তদন্তের জন্য যথেষ্ট ফরেনসিক সুবিধা এখনও গড়ে ওঠেনি। নারী ও মেয়ে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে দেশের ১০টি জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত স্থাপিত হয়েছে।

সরকারি চাকুরিতে নারীর জন্য আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিয়ে সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ অবারিত করে দশভাগ কোটা সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়াও তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণী পদে প্রবেশ পর্যায়ে শতকরা ১৫ ভাগ কোটা নির্দিষ্ট রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ নারী নিয়োগের কথা থাকলেও এখনও এটি শতকরা ২৫ এর উপরে নয়।

তৃতীয় অধ্যায়– 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য'

আমাদের জাতীয় লক্ষ্যকে সামনে রেখেই, জাতীয় নারী নীতির লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। আমাদের অন্যতম জাতীয় লক্ষ্য নারী পুরুষের সমতা আনয়ন। সে লক্ষ্যে নারীনীতির লক্ষ্যসমূহ হলো –

'জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা'; 'রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা'; 'নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা'; 'নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করা'; 'নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা'; 'নারী সমাজকে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা'; 'নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা'; 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা'; 'নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা'; 'নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা'; 'রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থসামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা'; 'নারীর স্বার্থের অনুকুলে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানী করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা'; 'নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা'; 'নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ন ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা'; 'প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা'; 'বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত নারীর চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা'; 'বিধবা, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যাক্তা, অবিবাহিতা ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা'; 'গণমাধ্যমে নারী ও মেয়েশিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরাসহ জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা'; 'মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা দেয়া'; 'নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা'।

চতুর্থ অধ্যায়– জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি

এ অধ্যায় এক অর্থে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির প্রাণ। আর এ নীতিসমূহ ঘোষণার জন্যই এত আয়োজন। আমাদের সার্বিক নীতিসমূহ এ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এখানে চৌদ্দটি মূলনীতি রয়েছে। এগুলোর প্রতিটির সাথে রয়েছে করণীয় সহনীতি সমূহ, প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে যা তুলে আনা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সহজে বুঝার জন্য প্রতিটি নীতির সাথে একটি করে সহনীতি উপস্থাপন করা হলো।

নীতি - নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার বাস্তবায়ন ।

সহনীতি - নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ সিডও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।

নীতি - মেয়েশিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধন এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা ।

সহনীতি - বাল্য বিবাহ, ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচার এবং পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা ।

নীতি - নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা ।

সহনীতি - নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন করা এবং নতুন আইন প্রণয়ন করা ।

নীতি - সশস্ত্র সংঘর্ষে নারীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা ।

সহনীতি - সশস্ত্র সংঘর্ষ ও জাতিগত যুদ্ধে নারীর অধিকতর নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা, সংঘর্ষ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা ।

নীতি - শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান ।

সহনীতি - জেন্ডার সমতার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আনয়ন করা ।

নীতি - নারীর জন্য অধিকতর হারে ক্রীড়া ও সংস্কৃতির প্রচলন ।

সহনীতি - স্থানীয় পর্যায়ে নারীর জন্য পৃথক ক্রীড়া কমপ্লেক্স গড়ে তোলা ।

নীতি - নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ।

সহনীতি - জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা ।

নীতি - নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন ।

সহনীতি - সরকারের নীতি নির্ধারণী পদসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর সম ও পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শতকরা ৩০ ভাগ পদে নারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সর্বাত্নক উদ্যোগ গ্রহণ করা ।

নীতি - স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ।

সহনীতি - পরিবার পরিকল্পনা ও সন্তান গ্রহণের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা ।

নীতি - গৃহায়ন ও আশ্রয় ।

সহনীতি - পল্লী ও শহর এলাকায় গৃহায়ন পরিকল্পনা ও আশ্রয় ব্যবস্থা নারী-প্রেক্ষিত অর্ন্তভূক্ত করা ।

নীতি - নারী ও পরিবেশ ।

সহনীতি - নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ নারী ও শিশুর পুনর্বাসন করা ।

নীতি - নারী ও গণমাধ্যম ।

সহনীতি - বিষয় আলোকে আইন, প্রচারনীতি, নিয়ন্ত্রণবিধি ও আচরণ বিধি প্রণয়ন করা ।

নীতি - জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সম অধিকার নিশ্চিতকরণ

জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরনের নীতিটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এটি সবিস্তারে বর্ণনা করা হলো ।

অর্থনীতিতে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে, যেসব-নীতিমালা অনুসরণের কথা বলা হয়েছে তা নিম্নরুপ-

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দূর করা; মুদ্রানীতি; বাণিজ্যনীতি; করনীতি প্রভৃতি প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে নারীর সম অধিকার নিশ্চিত করা; নারীর অনুকূলে সেফটি নেট গড়ে তোলা; সম্পদ, কর্ম সংস্থান, বাজার ও ব্যবসায়ে নারীকে সম অংশীদারীত্ব দেয়া; সুযোগ দেয়া; সমান মজুরি; কর্মস্থলে নিরাপত্তা; চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা; নারীর অর্থনৈতিক অবদানকে দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ সকল প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, পৃথক টয়লেট, শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া; শিক্ষা পাঠক্রমসহ অন্যান্য প্রকাশনা ও গণমাধ্যমে নারী অবমূল্যায়ন দূর করে ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলা ।

ঘোষিত এসব নীতিকে প্রতিফলিত করার জন্য কয়েকটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে । ক্ষেত্র সমূহ হলো

নারীর দারিদ্র দূরীকরণ, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারীর কর্মসংস্থান, সহায়ক সেবা, নারী ও প্রযুক্তি ও নারীর খাদ্য নিরাপত্তা -

নারীর দারিদ্র দূরীকরণের জন্য যা যা করা হবে – দরিদ্র নারীকে সংগঠিত করে, প্রশিক্ষিত করে অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা । অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ সকল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, জাতিসংঘের সেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারীর দারিদ্র দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দেওয়া । নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, তথ্য, উপার্জনের সুযোগ, উত্তরাধিকার, অর্জিত সম্পত্তির উপর অধিকার, নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া, একই সাথে প্রয়োজনীয় আইনও প্রণয়ন করা ।

নারীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য কোটা বৃদ্ধি করা হবে এবং তা বাস্তবায়ন করা হবে, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে কর্মসংস্থাননীতি অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা এবং নারী উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে । তাছাড়া নারীর কর্মসংস্থানের জন্য আইনের সংস্কার করা হবে । নারীর অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীকে সহায়ক, সেবা দেওয়া হবে ।

এজন্য শিশু যত্ন সুবিধা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নারীকে অর্থনৈতিক কাজে দক্ষ করতে হলে তার সংসারকে প্রযুক্তি নির্ভর করতে হবে। এক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, আমদানী ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা হবে। নারীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতি লক্ষ্য রেখে খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে।

সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা যেমন- শিশুযত্ন সুবিধা, কর্মস্থলে শিশু দিবাযত্ন পরিচর্যা কেন্দ্র, বৃদ্ধ, অক্ষম, প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য গৃহায়ন, স্বাস্থ্য, বিনোদনের ব্যবস্থা প্রবর্তন, সম্প্রসারণ এবং উন্নত করা হবে। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানী ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা হবে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে নারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হলে গবেষণার মাধ্যমে ঐ প্রযুক্তিকে নারীর প্রতি ক্ষতিকারক উপাদানমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থের অনুকূল লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করা হবে।

দু:স্থ নারীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও বিতরনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায়– জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন কৌশল

যে কোন নীতির বাস্তবায়ন কৌশল হলো নীতির জীয়নকাঠি। মূলত: এ জীয়নকাঠির উপর নির্ভর করে নীতি কতখানি সফলতা লাভ করবে অথবা ব্যর্থ হবে। ঘোষিত নীতি বাস্তবায়নের জন্য কৌশল সমূহ নিম্নরূপ –

নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা অধিদপ্তর, এবং জাতীয় মহিলা সংস্থাকে অবকাঠামোগত ও প্রশাসনিকভাবে শক্তিশালী করা হবে। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে গঠিত ৪৪ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদের কর্ম পরিধি নিশ্চিত করা হয়েছে।

কর্ম পরিধিতে রয়েছে – আর্থ সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, মহিলাদের আইনগত অধিকার, নারী উন্নয়ন ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্বন্ধে নীতি প্রণয়ন। জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির পরামর্শ প্রদান, মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থাসমূহের ফোকাল পয়েন্টসমূহে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে কর্মসূচি গ্রহণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রীকে সভাপতি এবং নারী উন্নয়নে চিহ্নিত ফোকাল পয়েন্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি-বেসরকারি নারী উন্নয়নমূলক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন এবং থানা ও জেলা পর্যায়ে নারীর অগ্রগতি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের প্রশাসন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও এনজিওদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম ও ইউনিয়নের নারীকে স্বাবলম্বীদল হিসেবে সংগঠিত করা হবে। এদলসমূহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার আওতায় নিবন্ধিকৃত সংগঠন হিসেবে রূপ দেয়া হবে। সরকারী, বেসরকারি উৎস, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ আহরণ করে এ

সংগঠনগুলোর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা-পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করা হবে।

প্রকৃত নারী উন্নয়ন একটি ব্যাপক কাজ। সরকারের একার পক্ষে এ কাজ করা অসম্ভব। তাই এ কাজে সরকারি -বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় ঘটানোর প্রয়াস নেয়া হবে। যাতে করে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করাই হবে সরকারের মূল দায়িত্ব।

অর্থনীতিতে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিতকরণের কৌশল

অর্থনীতিতে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিতকরণের কৌশল হচ্ছে নারী নীতির আর্থিক ব্যবস্থাপনা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে নারীর সম অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করা হবে–

তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। জাতীয় পর্যায়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে। নারী উন্নয়নে নিয়োজিত মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা যেমন, স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, শ্রম ও জনশক্তি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মসূচি চিহ্নিত করে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের সকল খাতে বিশেষ করে শিক্ষা, শিল্প, গৃহায়ণ, পানিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, এবং অন্যান্য উপখাতে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক ভৌত ও আর্থিক সম্পদ চিহ্নিত করে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ নারী উন্নয়নে আর্ন্তজাতিক উৎস থেকে নতুন ও অতিরিক্ত আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

শেষের কথা

স্বাভাবিকভাবে সংবিধানের পরেই নীতির স্থান। নীতি ছাড়া সরাসরি পরিকল্পনায় গেলে পরিকল্পনা সুষ্ঠু হয় না। কিন্তু নীতির প্রশ্নে আমরা বরাবরই বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ি। নীতি প্রণয়নের ইতিবাচক দিকটি অনৈতিক রাজনীতির শিকার হয়। এ অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষানীতি, নারীনীতিসহ প্রতিটি নীতির। ১৯৯৭ সালে প্রথম নারী নীতি ঘোষণার পর ২০০৪ সালে ইতিবাচক শব্দ পরিবর্তন করে নীতিকে বিপদগামী করার প্রচেষ্টার পলায়নপর নীতি, আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ২০০৮এ নীতি প্রদানের পর যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের দাবীকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য নারী নীতি নিয়ে বিধ্বংসী রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে সাবধান হতে বলে।

নারী নীতির প্রসঙ্গ আসলে পারিবারিক সম্পত্তির অংশীদারিত্বের প্রশ্ন একক বিষয় হয়ে ওঠে। কিন্তু নারীনীতি শুধু সম্পত্তি বিভাজনের বিষয় নয়।

উপস্থাপনায় আমরা পেয়েছি, এখানে নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার বাস্তবায়নে

মেয়েশিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধন এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন, নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূরীকরণ, সশস্ত্র সংঘর্ষ বন্ধের জন্য নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সম অধিকার নিশ্চিতকরণ, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, প্রশাসনিক ক্ষমতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, নারী ও গণমাধ্যমের কথা আছে। অতএব নীতির লক্ষ্য, মুক্তিযুদ্ধের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন।

বাংলাদেশ নারীকে অর্থনৈতিক সমঅধিকার দেবে কিনা, এটা এখন আর আলোচনার বিষয় হতে পারে না। নারী এখন অর্থনীতির চালিকা শক্তি। নারী সৈনিক, নারী পুলিশ এখন শান্তিরক্ষায় বিদেশী মিশনে যায়। দ্রুত অগ্রসরমান বিশ্বে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে আমাদের বিশ্ব-উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। অতএব দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি সেক্টরে আমাদের নীতির প্রয়োজন। প্রয়োজন শিক্ষানীতি, কৃষিনীতি, পানিনীতি, শতকরা পঞ্চাশজন নাগরিকের নারী নীতি।

আমাদের সংবিধানে নারী-পুরুষের সম অধিকারের কথা আছে। তবে সংবিধানে পারিবারিক আইনে ধর্মীয় অনুশাসনের কথাও রয়েছে। মুসলমান আইনে নারী পুত্র সন্তানের অর্ধেক সম্পত্তি পায়, হিন্দু সমাজে পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর আদৌ অংশীদারিত্বের অধিকার নেই। কিন্তু চলমান বিশ্বে নারীর দায়িত্বশীল অবস্থান ও অবদানের প্রেক্ষিতে অনেক দেশ যেমন নেপাল, ভারত, শ্রীলংকা এবং মুসলিম অধ্যুষিত দেশ মালদ্বীপে পুত্র-কন্যার সম-অধিকার দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৫-এর বেইজিং কর্ম পরিকল্পনার আলোকে ও সিডও-এর আদলে করা নারী নীতি '৯৭ এবং নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা উভয়টি বাংলাদেশ সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সামাজিক নারী সংগঠন সমূহ, এন.জিওদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফসল। একযুগ আগে ঘোষিত নারীনীতির প্রেক্ষিত পরিবর্তন হতে পারে, পরিসংখ্যান পরিবর্তন হতে পারে। ইতোমধ্যে মহিলা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নারী সংগঠনগুলোর সাথে এ বিষয়ে মতবিনিময় হয়েছে। এখন আমাদের প্রয়োজন সরকারের দৃঢ়তা এবং জনসচেতনতা।